চলচ্চিত্র-বিজ্ঞানী গোদার

তাপস রায়

জাঁ লুক গোদার এই শব্দবন্ধটি বিশ্বচলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের কাছে তাৎক্ষণিক দুটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই নামটি একদলের কাছে প্রশংসার শিহরণ সৃষ্টি করে আবার অপর একদল মানুষের কাছে এই একই নাম অপার ঘৃণার উদ্রেক ঘটায়। অথচ এই দুটোর কোনটাই কাম্য নয়। তোষামোদিযুক্ত প্রশংসা কিংবা যুক্তিবিহীন ঘৃণা আসলে গোদারকে ইতিহাসগতভাবে বুঝতে সাহায্য না করে তার চলচ্চিত্র সৃষ্টির তাৎপর্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমাদের বুঝতে হবে যে চলচ্চিত্র সমালোচকদের আসল দায়িত্বটা কি? এদের অধিকাংশই তো জীবনে কোনোদিন কোনো ছবি বানাবেন না, ছবির কলাকৌশলগত ব্যাপারে এদের বৃহদংশের অজ্ঞতা অপরিসীম। তাই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এদের বিচার প্রায়শই একমাত্র ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা না লাগার নিরিখে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের মান নিরূপণে বাস্তবতা বা অবজেকটিভ রিয়েলিটি অপেক্ষা ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণ এদের কাছে বেশি প্রাধান্য লাভ করে ফলে এ ধরনের চলচ্চিত্র সমালোচকদের বিচার নগ্নভাবে একপেশে হতে বাধ্য। যারা গোদারের প্রশংসায় গদগদ তাদের ব্যাপারে আলোচনার আগে যারা গোদারের অন্ধ সমালোচক তাদের বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। গোদারের বিরুদ্ধে এদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে গোদার শ্রমিক-কৃষক নিয়ে ছবি করেন না, গোদার দুর্বোধ্য। গোদারের সিনেমা মানুষ বোঝে না। খেয়াল রাখতে হবে যে চলচ্চিত্র সমালোচকের আসল কাজ হল চলচ্চিত্রকারের সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সেতুবন্ধ করা। আদপেই তা হয় না কারণ সেই ব্যক্তিগত ভালোলাগা বা না লাগার মাপকাঠিটাই এদের একমাত্র চালিকাশক্তি। তাই গোদার তার ছবিতে কি করেননি, সেটা নিয়েই এরা আলোচনা করেন, চলচ্চিত্র জগতে গোদার কি করেছেন তা এদের বিচার এড়িয়ে যায়। তাইতো শুরুতেই গোদারের ছবিকে দুর্বোধ্যতার তকমা দিয়ে তারা মানুষকে গোদার বিমুখ করে তোলে। শিল্প-সাহিত্য বা রাজনীতিতে দুর্বোধ্যতা বলে আদৌ কিছু আছে কি? ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে বাংলা

বর্ণমালা সহজবোধ্য না দুর্বোধ্য, অনেকে এটা হেঁয়ালী বলে ভাবতে পারেন কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এখানে দুর্বোধ্যতার ব্যাপারটা আসলে আপেক্ষিক। যারা বাংলা বর্ণমালা শিখেছেন তাদের কাছে তা সহজবোধ্য কিন্তু যারা শেখেননি তাদের কাছে এটা দুর্বোধ্য। বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, শুনে শুনে বাংলা কথা বলতে পারলেও, বাংলা বর্ণমালা চিনতে হলে বাঙালীকেও কিন্তু সেটা শিখতে হবে। না শিখেই যদি কেউ বলে বাংলা বর্ণমালা দুর্বোধ্য, সেটা কি মেনে নেওয়া যাবে? অর্থাৎ তথাকথিত দুর্বোধ্যতাকে সহজবোধ্যতায় উন্নীত করার একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষা। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। চলচ্চিত্র বুঝতে গেলে চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা থাকা জরুরী। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষকরা সে শিক্ষা দিতে পারেন, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেটা করতে পারেন চলচ্চিত্র সমালোচকেরা। সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে বিসর্জন দিয়ে চলচ্চিত্র ভাষায় সাধারণ দর্শককে শিক্ষিত করতে হবে। তা তারা করেন না। শুধু গোদারকে দোষ দেওয়া কেন? পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটা সহজবোধ্য? আর সহজবোধ্য হলেই কি তা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি? গোদার তো কোন্ ছার, কার্ল মার্ক্সের ক্যাপিটাল কি সহজবোধ্য? শ্রমিক দুর্দশার কথা ভেবেই লেখা যে ক্যাপিটাল, ক'জন শ্রমিক তার মর্মার্থ বুঝতে পারবে? আসলে উচ্চমানের যে কোন সৃষ্টিই আপাতবিচারে দুর্বোধ্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কি দুর্বোধ্য নয়? ক'জন সাধারণ মানুষ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝেন? গণসঙ্গীতের সরাসরি অভিঘাত সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী। তাহলে কি গণসঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চেয়ে শ্রেয়তর? নিউটনের অভিকর্ষ বিজ্ঞান বা আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি কি সহজবোধ্য? জেমস জয়েসের ইউলিসিস কি সহজবোধ্য? এগুলোর একটিও কি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে? সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে? তাহলে গোদারকে শুধু দোষারোপ করা কেন? দুর্বোধ্যতার তকমা লাগিয়ে আগে থেকেই গোদারকে সমালোচনা করলে কার্ল মার্ক্স বা জেমস জয়েস বা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কেও বাতিল করতে হয়। গোদারের অন্ধ সমালোচকদের সে সাহস আছে কি? এটাতো একধরনের ভাবের ঘরে চুরি যে দুর্বোধ্যতার তকমা লাগিয়ে গোদারের অন্ধ সমালোচনা যে সমালোচকরা করবেন তারাই দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও কার্ল মার্ক্স বা জেমস জয়েস বা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে মাথায় তুলে নাচেন? স্ব-বিরোধিতার পঙ্কিল আবর্তে ডুবে থাকা এ ধরনের সমালোচকেরা আসলে চলচ্চিত্র আলোচনাটাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। এবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বা 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন কেষ্টা ব্যাটাই চোর'এর রবীন্দ্রনাথ যতটা সহজবোধ্য 'উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগের' রবীন্দ্রনাথ কি ততটা সহজবোধ্য? তাহলে কি কবিতা হিসাবে প্রথম দুটো 'আফ্রিকা' কবিতার চেয়ে শ্রেয়তর? পাগলেও বোধহয় তা বলবে না। প্রথম দুটো কবিতা সহজবোধ্য

কারণ সেখানে ব্যবহৃত শব্দগুলো দৈনন্দিন ব্যবহারে মানুষের কাছে জলভাত কিন্তু 'আফ্রিকা' কবিতা বুঝতে গেলে তো উদভ্রান্ত শব্দটার মানে বুঝতে হবে। অর্থাৎ চাই এক ন্যূনতম শিক্ষা। সেটা দিতে পারেন শিক্ষকেরা। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সে কাজ সমালোচকদের।

কিন্তু গোদারের সমালোচকরা তা করেন না কারণ তারা আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছেন গোদার যে ধরনের ছবি করেছেন সেটা তারা পছন্দ করবেন না। এদের এ ধরনের লেখায় গোদারের কোন ক্ষতি হবে না কারণ এদের লেখা গোদার কোনদিন পড়বেনও না কিন্তু ক্ষতি হবে চলচ্চিত্র বুঝতে চাওয়া অসংখ্য সাধারণ মানুষের যারা চলচ্চিত্র সমালোচকদের লেখনীকে কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেন। তাহলে কি গোদারের সমালোচনা করা যাবে না? আদৌ তা নয়। কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। হতে পারেন না। কিন্তু বিচারের মাপকাঠিতে যেন সামঞ্জস্য থাকে। সেটা কিন্তু থাকছে না। গোলমালটা সেখানেই। বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে পৃথিবীতে একেবারে নিখুঁত বা পারফেক্ট বলে কিছু নেই। গ্যাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদর্শ গ্যাস পৃথিবীতে নেই, বিন্দুর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিন্দু আঁকা অসম্ভব। তাইতো গোদারের কাজের সমালোচনা হবে না তা হতে পারে না। তাইতো এমন কি প্রশংসার শিহরণ বয়ে যাওয়া সমালোচকরাও বহু ক্ষেত্রে গোদারের সমালোচনা করেছেন। তবে তা বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেকটিভ রিয়েলিটির সাপেক্ষে যা কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের প্রোথিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রমিক-কৃষক নিয়ে ছবি তো হতেই পারে কিন্তু শ্রমিক-কৃষক মূল চরিত্র হিসাবে না থাকলেই সেই চলচ্চিত্রকে সমালোচনা করতে হবে? আসলে এই ধরনের সমালোচকেরা শ্রমিককেও ভালবাসেন না বা কৃষকের কথাও ভাবেন না। অধিকাংশ সময়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসে শ্রমিক-কৃষককে ভালবাসার ভান করেন। কারণ বাজারে সেটার কাটতি বেশী। পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে এবার একটু দেখা যাক যে যারা সত্যি সত্যিই সারাজীবন শ্রমিক-কৃষক নিয়ে ভেবেছেন তাঁরা কি ধরনের চলচ্চিত্র পছন্দ করেন? জোসেফ স্তালিনের নামটা এসে যাচ্ছে। তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল : দি লষ্ট প্যাট্রল (১৯৩৪), হিজ বাটলারস সিস্টার (১৯৪৩), টার্জান, দি এপ ম্যান (১৯৩২), কাটিরা (১৯৩৮), স্টেজকোচ (১৯৩৯), দি গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০)। এগুলোর কোনটায় শ্রমিক-কৃষকের প্রাধান্য নেই। বিষয় হিসাবে আছে নরনারীর ভালবাসা, ওয়েষ্টার্ন, রাজনৈতিক স্বৈরাচার ইত্যাদি। তিনি আমেরিকান ছবি পছন্দ করতেন। ফ্রাঙ্ক কাপরা ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় পরিচালক। চ্যাপলিনের লাইম লাইটের শেষ দৃশ্যে তিনি কেঁদেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখা থেকে এই তথ্য সংগৃহীত। তিনি নিশ্চয়ই আইজেনস্টাইন, ডবঝেঙ্কো দেখেছিলেন কিন্তু অন্য ছবিগুলোর প্রতি তাঁর ভালবাসা একথাই প্রমাণ করে যে প্রকৃত শ্রমিক-কৃষক দরদী হয়েও তিনি মনে

করতেন না চলচ্চিত্র শুধুমাত্র শ্রমিক-কৃষকের জীবনধারণই দেখাবে। তা হলে এ ব্যাপারে অন্তত ঠাণ্ডা ঘরে বসা শ্রমিক-কৃষক দরদীদের গোদার বিরোধী অভিযোগ খাটছে না। আমরা জানি যে ১৯৭৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি 'শোলে' বাণিজ্যিকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যদিও নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে ছবিটি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। তথাপি নির্মাণশৈলীর জন্য স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এ ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যস আর যায় কোথায়, সমালোচকেরা বলে উঠলেন সত্যজিৎ রায় ভাল বলেছেন তাই আমাদেরকেও শোলেকে ভাল ছবি বলতে হবে। এরা তাই শোলে নিয়ে আলোচনা উঠলে সত্যজিতের দোহাই দেন কিন্তু একই সত্যজিৎ যখন দ্ব্যর্থহীন ভাবে গোদারের চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলীর প্রশংসা করে গোদারকে অতি উচ্চ আসনে বসান তখন এরা ঢোঁক গেলেন। অর্থাৎ আগে থেকেই এদের শোলে ভাল লেগেছিল তাই এরা এমন এক বিদগ্ধ লোক খুঁজছিলেন যিনি এদের ভাললাগার শরিক হবেন। হাতের কাছে পেয়ে গেলেন সত্যজিৎকে, অথচ এই সত্যজিৎ রায়ই তো সারা জীবনে শুধুমাত্র ন্যারেটিভ বা আখ্যানমূলক ছবি করেও যখন গোদারকে প্রশংসা করেন তখন এরা প্রমাদ গোনেন। আসল ব্যাপার হল যে সত্যজিৎ রায় এদের মনের মতো কথা বলেন সে সত্যজিৎ রায়ই এদের পছন্দ। গোদারের প্রশংসাকারী সত্যজিৎ একেবারেই নয়। আসলে সত্যজিৎ হয়তো বুঝেছিলেন যে চলচ্চিত্র শিল্প যেহেতু একান্তই দেশজ সংস্কৃতির আবহে গড়ে ওঠা এক শিল্পকর্ম, তাতে সে দেশের প্রভাব থাকবেই। কে বলতে পারে সত্যজিৎ রায় ফ্রান্সে জন্মালে গোদারের মতো নির্মাণশৈলী ব্যবহার করতেন কি না বা উল্টোটা হলে অর্থাৎ গোদার কলকাতায় জন্মালে সত্যজিতের মতো আখ্যানমূলক ছবিই করে যেতেন কি না। একথা বলার অর্থ হল এই যে মানুষের ভৌগোলিক অবস্থান অনেকাংশে তার শিল্পসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যবধান সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় কিন্তু পরবর্তীকালে একেবারে গোদারীয় ভঙ্গীতে তাঁর শেষের দিকের ছবিগুলো করেছিলেন। গোদারের প্রতি এটাই সত্যজিতের বড়ো কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা তাঁর সে সব ছবিতে গোদারের ছবির প্রভাব। আশ্চর্য হলেও এটা সত্য। এ লেখায় ক্রমশ তা প্রকাশ পাবে।

গোদার সম্পর্কে বলা হয় যে প্যারিসে গোদারের ছবি কেউ দেখে না অর্থাৎ তাঁর ছবি বাণিজ্যসফল নয়। আদতে বাণিজ্যিক সফলতা কোনো শিল্প-বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। চটুল হিন্দী ছবি তো বাণিজ্যসফল, তাহলে কি এগুলোই আমাদের সেরা ছবি বলে মানতে হবে? বাংলা আধুনিক গান তো ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চেয়ে অধিক জনপ্রিয়। তাহলে কি বলতে হবে মার্গসঙ্গীত অপেক্ষা আধুনিক গান উচ্চস্তরের? আসলে অধিকাংশ মানুষ গুণগতভাবে খারাপ কাজের প্রতি ধাবিত হয় এটা এক অমোঘ সত্য। এই তথাকথিত দর্শকানুকুল্য সম্বন্ধে গোদার এক অসাধারণ কথা বলেছিলেন, "দে হ্যাভ

অডিয়েন্স বাট মাই ফিল্মস হ্যাভ ভিউয়ারস।" দর্শকের সংখ্যা যত বেশী দ্রষ্টা তত কম। তিনিও নিশ্চয়ই চাইতেন তাঁর ছবি আরও বেশী সংখ্যক দর্শক দেখুক কিন্তু সে লোভে তিনি স্বকীয় শিল্পকর্মের মান নামাতে রাজি ছিলেন না।

তাহলে তথাকথিত দুর্বোধ্য এবং বাণিজ্যিকভাবে চূড়ান্ত অসফল গোদারকে নিয়ে সারা পৃথিবী আলোচনায় মেতে উঠবে কেন? গোদারকে দুর্বোধ্যতার তকমা দেওয়া ব্যক্তিবর্গ দর্শককে বোকা ভাবেন বলেই সমস্যা। তাঁরা আগে থেকেই ধরে নেন যে দর্শক কিছু বুঝবে না। অথচ গোদার কিন্তু সবসময় দর্শককে মাথায় করে রাখতেন। দর্শক জড়বস্তুর মতো পপকর্ণ চিবোতে চিবোতে গদিআঁটা চেয়ারে আসীন হয়ে নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে থাকবে তা তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন দর্শক যেন মনে মনে তাঁর সাথে কথোপকথন চালায়। ছবি দেখাকালীন দর্শকের মস্তিষ্ক যাতে সক্রিয় থাকে, দর্শককে এভাবে নিজের সমকক্ষ ভাবা কি অপরাধ? তাঁর বিচারে নিষ্ক্রিয় দর্শক কোনো দর্শকই নয়। দর্শকদের নিষ্ক্রিয় থাকতে চাওয়ার গূঢ় রহস্য কিন্তু আমাদের সমাজেই লুকিয়ে আছে। ছোটবেলা থেকেই সারা পৃথিবীর শিশুরাই মা, ঠাকুমা বা দিদিমার কোলে শুয়ে ঘুমপাড়ানি গল্প শোনে যাতে আদি, মধ্য ও অন্ত পরপর বলে যাওয়া হয়। এক লহমায় শিশুর অবচেতন মনে গল্প শোনার চাহিদা তৈরি হয়ে যায়। এর পর কি, তার পর কি একথা তাদের অবচেতন মনে প্রোথিত হয়ে যায়। সেদিন থেকেই কাহিনির পারম্পর্যর বীজ তাদের মধ্যে বপন করা হয়ে যায় যা থেকে বড়ো হবার পরেও তারা মুক্তি পায় না। তারা তাই কাহিনির দাস হয়ে পড়ে। তারা একমুখী এবং সরলরৈখিক আখ্যানমূলক ছবি দেখতে পছন্দ করে ফেলে। তার ব্যতিক্রম হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রখ্যাত আমেরিকান জীববিজ্ঞানী স্টিফেন জে গোউল্ড বলেছিলেন মানুষ আদতে কাহিনির দাস। মানবজাতির নাম হোমো সেপিয়ান না হয়ে হোমো ন্যারেটর হলে ভালো হোত কারণ আমরা মূলত গল্প বলিয়ে প্রাণী। ছোটবেলা থেকে গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে আমাদের পাভলভ কথিত কণ্ডিশনও রিফ্লেক্স বা শর্তাধীন প্রতিবর্তী ক্রিয়াশীল করে গড়ে তোলা হয়। আর গোদার ঠিক এখানেই আঘাত করেন। তিনি কখনও চান না দর্শক নিষ্ক্রিয়ভাবে গল্পের স্রোতে ভেসে যাক। তাই তো তিনিই বলতে পারেন যে তাঁর ছবিতে সরলরৈখিক গল্পের মতোই আদি, মধ্য ও অন্ত আছে কিন্তু তা পরপর সাজানো নয়। দর্শককে তা খুঁজে বার করতে হবে। অর্থাৎ দর্শককে হতে হবে সক্রিয়। চলচ্চিত্রকার হিসাবে এটাই তাঁর প্রথম অবস্থান। মনে পড়ে যায় কার্ল মার্ক্সের সেই বিখ্যাত উক্তি—'দি ফিলোজফারস হ্যাভ ইন্টারপ্রেটেড দি ওয়ার্ল্ড, উই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট।' গোদারও যেন বলতে চাইছেন—আই এ্যাম হিয়ার টু চেঞ্জ দি সিনেমাটিক ওয়ার্ল্ড। পরে তিনি এ ধরনের কথা বলেওছিলেন।

চলচ্চিত্রকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার আগেও গোদার অন্যভাবে চলচ্চিত্রের সাথে

যুক্ত ছিলেন। আঁরি ল্যাংলোয়ার তত্ত্বাবধানে সিনেমাথেক ফ্রাঁসেজএ তিনি দেশবিদেশের ছবি দেখতে থাকেন এবং একই সঙ্গে সেখান থেকে প্রকাশিত 'কাহিয়ে দ্যু সিনেমা' পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা একবার বলেছিলেন যে 'দি বেস্ট ওয়ে টু ক্রিটিসাইজ এ ফিল্ম মেকার ইজ বাই মেকিং এ ফিল্ম।' গোদার কিন্তু তা করে দেখিয়েছিলেন। শুধুমাত্র খোঁচা দেওয়া সমালোচকের ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। আমাদের দেশে এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সত্যজিৎ রায়। দর্শকদের মতোই বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রকারদের প্রতিও গোদারের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাই নিজে সরলরৈখিক আখ্যানমূলক ছবি না বানালেও এ ধরনের বহু চলচ্চিত্র নির্মাতাকে তিনি প্রশংসা করেছেন। তিনি নিজে কোনোদিন যে ধরনের ছবি করবেন না, সে ধরনের ছবি করিয়েদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁর চরিত্রের উদারতা প্রমাণ করে। অর্থাৎ তিনি এক ধরনের ছবি করায় বিশ্বাসী হয়েও সেটাকেই চলচ্চিত্রের শেষ কথা বলে মনে করেন না। চিন্তার এই বহুমুখীনতাই তো তাঁকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলে। অর্থাৎ এখানে তিনি নির্মম ইতিহাসবিদের ভূমিকা পালন করেন। এমন কি যে বার্গম্যান তাঁর নির্মাণশৈলীকে একেবারেই পছন্দ করতেন না, সেই বার্গম্যানের বহু ছবিকেই তিনি কিন্তু বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মাইলস্টোন বা দিকদর্শক মনে করেছেন। বার্গম্যান তাঁর সমালোচনা করলেও বার্গম্যানের ছবি বিচার করতে বসে গোদার কিন্তু সেটা মনে রাখেন না। ব্যক্তিগত পূর্বধারণাপ্রসূত পছন্দ অপছন্দের দ্বারা গোদার কখনও চালিত হননি। তাই তো গোদারকে যখন প্রত্যেক দশকের সেরা দশটি ছবির তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয় তিনি বারে বারে বার্গম্যানের ছবিকে স্থান দিয়েছেন। বার্গম্যানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা গোদারের রাজনৈতিক চিন্তাধারা একই অক্ষে না থাকা সত্ত্বেও সে কারণে তিনি বার্গম্যানকে সমালোচনা করেননি। বার্গম্যানের কাজকে অপাংক্তেয় মনে করেননি। যে গোদার একসময় বলেছিলেন 'এভরি অস্কার ইজ এ্যান অ্যাক্সিডেন্ট', সেই গোদারই আমেরিকান ছবিকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি। দি গার্ডিয়ান পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমেরিকান ছবি সম্পর্কে গোদার বলেন বিশেষ করে ১৯৩০-১৯৫০ সালের মধ্যে নির্মিত ছবির ক্ষেত্রে "দে কুড মেক ফিল্মস লাইক নো ওয়ান কুড"। আবার পরবর্তীকালের সাধারণ আমেরিকান ছবির ক্ষেত্রে এই গোদারই বলেন : "নাউ ইভেন দি নরওয়েজিয়ানস ক্যান মেক ফিল্মস এ্যাজ ব্যাড এ্যাজ আমেরিকানস্।" কিন্তু অস্কারকে যে তিনি দুর্ঘটনা বলে ভুল কিছু বলেননি তা একটি ঘটনায় পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যখন ১৯৪১ সালে অরসন ওয়েলস-এর 'সিটিজেন কেন'কে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার না দিয়ে জন ফোর্ডের 'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালী'কে দেওয়া হয়। এই সেই 'সিটিজেন কেন' ছবি গোটা দশকের পর দশক ধরে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র নির্মাতা তথা চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে দশটি সেরা

ছবির মধ্যে বারেবারেই প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। অস্কার কর্তৃপক্ষ গোদারের সাম্মানিক লাইফটাইম এ্যাচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড দেবার কথা ঘোষণা করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে গোদার যাননি। তথাকথিত বুর্জোয়া পরিবেশে লালিত গোদার কিন্তু অস্কারের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়েছিলেন। যখন দেখা যায় অনেক ঘোষিত বামপন্থী পরিচালকও অস্কার পাওয়ার আশায় লালায়িত হয়ে থাকেন। আবার এই গোদারই ১৯৫৪ সাল থেকে দিনের পর দিন কাহিয়ে দ্যু সিনেমার পাতায় হিচকক, হক্‌স, রবার্ট অলড্রিচ, নিকোলাস রে এবং ফ্রিৎস ল্যাঙ-এর প্রশংসা করেন। এমন কি তিনি একথাও বলেন যে 'নিকোলাস রে ইজ সিনেমা এ্যাণ্ড সিনেমা ইজ নিকোলাস রে।' গোদারের এই আমেরিকান ছবির প্রশংসা তৎকালীন সম্পাদক আন্দ্রে বাজাঁ একেবারেই ভালোভাবে নেননি। এখানেই গোদার এবং তাঁর সহকর্মীরা যথা জ্যাক রিভেত, এরিক রোমার, ক্লদ শ্যাব্রল, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো চলচ্চিত্রে পরিচালকদের একমাত্র ভূমিকার প্রশ্নে লেখনী ধরেন যার নামকরণ এ্যান্ড্রু সারিস পরবর্তীকালে 'অতর থিয়োরী' বলে লেখেন।

চলচ্চিত্র পরিচালনায় পাকাপাকিভাবে আসার আগে গোদারের জীবনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো আন্দ্রে বাজাঁ সম্পাদিত কাহিয়ে দ্যু সিনেমা পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেখানে তাঁর লেখনী যে কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরপূর্ণ ছিল না পরবর্তীকালে একের পর এক যুগান্তকারী চলচ্চিত্র পরিচালনা করে তিনি তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেন। পাঁচের দশকের প্রথম ভাগে গোদার এবং তাঁর সঙ্গী এরিক রোমার, জ্যাক রিভেত, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো প্রমুখ চলচ্চিত্র-সমালোচক হিসাবে নিজেদের ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ক্লান্তিহীন ভাবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবি দেখতে থাকেন। তাঁদের কাছে ছবিগুলো ছিল অধ্যয়নের সামিল। কোনো কোনো ছবি তাঁরা আট দশ বা কুড়ি বারও দেখতেন। চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিসমন্বিত পর্যবেক্ষণ ব্যতীত পরবর্তীকালে আমরা ফস্‌বিণ্ডার, হারজোগ বা হ্বিম ওয়েনডারসকে পেতাম কিনা সন্দেহ। জার্মান এই পরিচালকত্রয়ী ছাড়াও আমেরিকার মার্টিন স্করসিস বা ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলাকেও আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়েই আমরা প্রথম আলফ্রেড হিচকক, জন ফোর্ড বা হাওয়ার্ড হকসের নবমূল্যায়ন করতে সক্ষম হলাম। স্যামুয়েল ফুলার, নিকোলাস রে, বিলি ওয়াইল্ডার বা উইলিয়াম ওয়াইলার প্রমুখের চলচ্চিত্রশৈলীর নবতর ব্যাখ্যা সে সময়কার তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা বুঝতে পারলাম। গোদার এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা প্রথম আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে চলচ্চিত্র কিভাবে দেখতে হয় তা শেখালেন। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত গুরুত্বের বিষয়টাও আমাদের গোচরে আনেন এই গোদারেরাই।

পৃথিবীতে অনেক চলচ্চিত্রকার এসেছেন, আরও অসংখ্য আসবেন কিন্তু গোদারকে

বলা যেতে পারে প্রথম চলচ্চিত্রবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে বস্তুর বাহ্যিক অবয়বের অন্তর্নিহিত রূপটি বোঝার চেষ্টা করা। গোদারও তাই করেন। একথা অনস্বীকার্য যে চলচ্চিত্র রূপে আমরা যা দেখি তা বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া কিছু নয়। টমাস আলভা এডিসন প্রমাণ করেছিলেন যে স্থির চিত্রের ২৪টা ফ্রেম যদি এক সেকেণ্ডে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হয় তবে সেগুলো আর স্থির চিত্র বলে মনে হবে না। মনে হবে যে আমরা চলমান ছবি দেখছি। তার কারণ পূর্বের স্থির ছবিটির রেশ কাটতে না কাটতেই পরবর্তী স্থির ছবিটি পর্দায় প্রক্ষেপিত হলে চলমানতার একটা বিভ্রম তৈরি হয়। এটাই পারসিসটেন্স অফ ভিশান নামে পরিচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রমাণ করলো যে প্রেক্ষাগৃহে চলমান ছবি বলে যা দেখি তা আদপেই চলমান নয়, স্থির চিত্রের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব আর বৈজ্ঞানিক বাস্তব এক জিনিস নয়। দৃষ্টি বিভ্রমের নামই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রকাররা এটা সকলেই জানতেন কিন্তু গোদারই প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেন 'সিনেমা ইজ ট্রুথ টোয়েন্টিফোর ফ্রেমস পার সেকেণ্ড।' অর্থাৎ চলচ্চিত্রে দেখানো বাস্তব আদতে বাস্তব নয়। যন্ত্রের এক কৌশলমাত্র যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্থির ছবিকে চলমান ছবি হিসাবে দেখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই সিনেমা এক আঙ্গিকগত মাধ্যম। নন্দনতত্ত্ব আঙ্গিকের অনুগামী মাত্র। বিজ্ঞানী কোনো বস্তুর বহির্অবয়বের দ্বারা সন্তুষ্ট হন না, সর্বদা অন্তর্অবয়ব সন্ধানের চেষ্টা করেন। বাইরের অবয়বকে কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকরা পুজো করতে পারেন, বাইরের অবয়ব নিয়ে গাথা রচনা করতে পারেন কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতো ভিতরের অবয়ব সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকার ফলে তাদের গাথা-রচনায় অনেকে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারেন কিন্তু সমাজ তাতে এক বিন্দুও এগোয় না। ফুল বা ফুলের রং দেখে কবি রোমাণ্টিকতায় ভেসে যেতে পারেন কিন্তু বিজ্ঞানীই একমাত্র বুঝতে পারেন যে লাল ফুল লাল কেন বা হলদে ফুল হলদে কেন। চাঁদকে কবির কল্পনায় ঝলসানো রুটি মনে হতে পারে কিন্তু চাঁদের ভেতরে কি আছে জানতে গেলে বিজ্ঞান ছাড়া উপায় নেই। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। এই সর্বজনবিদিত সত্যটা সামনে এনে গোদার বিজ্ঞানীর কাজই করলেন। কারণ চলমান ছবি বলে চলচ্চিত্রে যা বোঝানো হচ্ছে তা বাস্তবতা থেকে বহুদূরে। আসলে সেকেন্ডে ২৪টা স্থির চিত্র প্রক্ষেপণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র আমাদের মিথ্যা কথা বলছে। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে চলচ্চিত্রে প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টা মিথ্যা আমাদের সামনে দেখানো হচ্ছে, আর এই মিথ্যাকেই সত্য বলে ভাবার এক কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স আমাদের গিলে খাচ্ছে। তাই তো চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম দিন থেকেই গোদারের চিন্তা যে আঙ্গিক মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সেই আঙ্গিককে সিনেমায় কিভাবে একাত্ম করা যায় তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে ব্যাকরণ অর্থাৎ আঙ্গিক, পরে ভাষা

বা শৈলী। কল্পবিজ্ঞানের ব্যক্তিদের কাছে এটা অস্বস্তির সৃষ্টি করলেও এটা অমোঘ সত্য। গোদার সারা জীবন সেই সত্যের পূজারী থেকেছেন। গোদারের ছবি নিয়ে আলোচনা করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে গোদার এক অত্যন্ত বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকার এবং যতই তাঁকে দুর্বোধ্যতার প্রাচীর তুলে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন এটাও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে গোদারের সারাজীবনের কাজ সমস্তই বাস্তব থেকে গ্রহণ করা। বাস্তবে যা ঘটে তার বাইরে তিনি কিছুই করেননি। একজন চলচ্চিত্র বিজ্ঞানী হয়ে তিনি তা করবেনও না।

মানুষ নামক প্রাণীটি পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার দিন থেকেই বাস্তবতার দুটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। একটা স্থূল বাস্তব আর একটা অন্তরের বাস্তব। পৃথিবীর খুব কম চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে গোদার একজন যার কাছে এই দুটো বাস্তবতাই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। আঙ্গিকগত অন্তর্বাস্তব আর বিষয়গত বহির্বাস্তব তাঁর চলচ্চিত্রকর্মে হাত ধরাধরি করেই চলেছে।

তাঁর প্রথম কাহিনিচিত্র 'ব্রেথলেস' থেকেই এটা বোঝা যায়। ব্রেথলেস করার আগেই বোঝা গিয়েছিল তিনি কিভাবে ছবিটি করবেন। আমরা সকলে জানি যে শুটিং পর্ব থেকেই চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু গোদার তা মনে করেন না। তার মতে শুটিং এর আগে পরিচালকের মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পাদনার একটা আদল তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ শুটিংপর্ব শুরু হবার আগেই কিভাবে শুটিং করবেন তার একটা আদল মনশ্চক্ষে দেখা যায়। সেজন্য শুটিং তাঁর কাছে আদতে পোস্ট প্রোডাকশন। এভাবে কেউ আগে ভাবতেই পারেননি। তাই সম্পাদনার এক নতুন দিগন্ত তাঁর প্রথম ছবিতে খুলে যাবে তার ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। এ যেন সেই জুলিয়াস সিজার কথিত ভিনি ভিডি ভিসি অর্থাৎ এলাম, দেখলাম, জয় করলাম গোছের। ১৯৬০ সালে ছবিটি মুক্তিপ্রাপ্ত হতেই চলচ্চিত্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কি এমন করলেন যার ফল এই আলোড়ন? অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক।

এই প্রথম ছবিতেই চলচ্চিত্র নির্মাণের সব প্রচলিত ধ্যানধারণার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। অবশ্যই আনাড়ির মতো নয়, চলচ্চিত্র ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য মেনেই। আনলেন চলচ্চিত্র সম্পাদনার এক নতুন হাতিয়ার 'জাম্প-কাট'। বলা যেতে পারে এক নতুন আধুনিকতার জন্ম দিলেন গোদার। একমাত্র অরসন্ ওয়েলস-এর সিটিজেন কেন ছাড়া আর কোন পরিচালকের প্রথম ছবি এভাবে চলচ্চিত্র জগতের ভিত নড়িয়ে দিতে পারেনি। এই জাম্প কাট বস্তুটি কি? এতাবৎকাল চলচ্চিত্রে একটি শট থেকে আর একটি শটের মাঝখানে যেতে হলে প্রথম শট এবং পরের শটের অন্তর্বর্তী একটি রিএ্যাকশন শটের প্রয়োজন হোত। যাকে বলে এষ্টাব্লিশিং শট। দর্শকের দোহাই দিয়েই

এটা করা হয় যাতে তারা শট থেকে শটান্তরে যাওয়ার অর্থ বুঝতে পারে। পৃথিবীতে অত্যন্ত প্রভাবশালী আমেরিকান ছবি আদ্যোপান্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। তার প্রভাবে অন্য দেশের ছবিও তাই। ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ প্রদর্শিত এই পথের নাম কন্টিনিউয়াস ইনভিসেবল এডিটিং। তাঁরা ভাবলেন এটা ছাড়া দর্শক দুটো শটের মধ্যকার যোগসূত্র খুঁজে পাবে না। কিন্তু গোদার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলেন এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। আগেই বলেছি গোদার বাস্তবতার বাইরে কিছুই করেননি। কিভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষ দুটি বাস্তবকে পাশাপাশি নিয়ে চলে। একটা তার বাইরের আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব আরেকটা তার পাশাপাশি ঘটতে থাকা অন্তরের বাস্তব। বাইরের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব হলো মানুষ ঘুম থেকে ওঠে, প্রাতঃকৃত্য করে, জলখাবার খায়, কাজের ক্ষেত্রে যায়, ফিরে আসে। রাতে বই পড়ে বা টিভি দেখে এবং শেষে ঘুমোতে যায়। এই স্থূল বাস্তব নিয়ে গোদারের কোনো আগ্রহ নেই। বেঁচে থাকার জন্য এগুলো একান্ত জরুরী হলেও। এই বহির্বাস্তবের সমান্তরালভাবে মানুষের মনে প্রতিদিন অজস্র ঘটনা ঝিলিক মেরে যেতে থাকে। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ তার ছোটবেলার এক দৃশ্য এক লহমার জন্য মনে পড়েই আবার মিলিয়ে যায়। অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে বসে হঠাৎ তার সন্তানের মুখ মনে পড়ে যায়, প্রতিদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সে পারম্পর্যহীন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ মানুষের মনে এক দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যে যাবার জন্য তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী দৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। তাই আমাদের মনে অহরহ জাম্পকাট সদৃশ শটের আনাগোনা চলতেই থাকে। বহির্বাস্তবের বিপরীতে অন্তর্বাস্তবের এই দিকটা গোদারকে বেশি আকর্ষণ করে। বহির্বাস্তবের দাসত্ব করা মানুষ তাই এই অন্তর্বাস্তবকে বাস্তবতা বলে মানতে চায় না। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে গোদার বাস্তবের এই দিকটিই তুলে ধরেন। তাই অনেক তথাকথিত বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকারের থেকেও তিনি বেশি বাস্তববাদী। শট, রিভার্স শট এই ধারণা তিনি 'ব্রেথলেস' ছবিতে ভেঙে চুরমার করে দেন। যে দর্শক প্রতিমুহূর্তে মনের ভেতর অহরহ জাম্পকাট সদৃশ ঘটনার নীরব সাক্ষী থাকছেন, সে দর্শক জাম্পকাটা বুঝবে না গোদার তা বিশ্বাস করেন না। তাঁর বিচারে মানুষ এত বোকা নয় যে তৃতীয় শটের সাহায্য ছাড়া অন্য দুটে শটের মানে তারা বুঝবে না। মানুষের প্রতি কি অসীম আস্থা। পুলিশের তাড়া খেয়ে মানুষ যখন ছোটে তখন তার চোখের সামনে অতি দ্রুত দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটে যায়। বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তাই গোদার তাঁর প্রথম ছবিতে পুলিশের তাড়া খাওয়া ছবির মূল চরিত্র মাইকেলকে দেখান, তার পড়িমড়ি ভঙ্গীকে গাড়ি চালানোর বাস্তবানুগ অভিঘাত আনতে হাতে ধরা ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করেন। কারণ বাস্তবে মানুষের ধাবমানতার মধ্যে যে ঝাঁকুনি থাকে সেটাই তিনি তাঁর ছবিতে দেখাতে

চেয়েছিলেন। হাতে ধরা ক্যামেরার অবশ্যম্ভাবী কম্পন ছাড়া সেটা সম্ভব হতো না। এতো গেল আঙ্গিকের কথা। বিষয়গত দিক থেকেও তিনি দেখান যে সমাজচিন্তা বহির্ভূত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। কে বলে তিনি সমাজ-সচেতন শিল্পী নন? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমরা কিম্ভুৎ, আমরা নতুন যৌবনের দূত।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন নতুন যৌবনেরই দূতকে কিম্ভুৎ হতেই হবে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাই গোদারের এই ছবি নতুন যৌবনের দূত হিসাবে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে কিছুটা কিম্ভুৎ হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। সমাজে একদল মানুষ আছেন যারা স্থিতাবস্থা পছন্দ করেন অর্থাৎ যা চলছে চলুক, কোনো পরিবর্তনের দরকার নেই। এই ধারণার বাহকেরা কিন্তু সমাজের এগিয়ে চলার শত্রু। সব মানুষ এমন হলে মানুষ আজও গুহামানব হয়ে থাকত। পরিবর্তন চাওয়াই সমাজের চালিকাশক্তি। তাই যারা শুধুমাত্র একমাত্রিক বর্ণনামূলক, আখ্যানমূলক, অদৃশ্য সম্পাদনাযুক্ত ছবিকেই একমাত্র সিনেমার শেষ কথা বলে মনে করেন তারা আসলে অচলাবস্থারই সমর্থক। তারা ইচ্ছে করেই ভুলে যান যে চলচ্চিত্রের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ল্যুমিয়ের ভাইদের পাশাপাশি জর্জ মেলিয়ে বলে এক চলচ্চিত্রকার ছিলেন যিনি সেদিনও সিনেমাকে শুধু গল্প বলার কাজে ব্যবহার করতে চাননি। শট নিয়ে, দৃশ্য নিয়ে অসংখ্য চিন্তা ভাবনা করেছেন। কিন্তু তাকে ভুলিয়ে দেবার অপচেষ্টার শেষতম ধাপ গোদারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরোধিতা করা। কার্ল মার্ক্স যেমন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, গোদারও তেমনই তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে এই জাম্পকাট তো গোদার প্রথম ব্যবহার করেননি। এর জনক ছিলেন জর্জ মেলিয়ে। ১৮৯৬ সালে ভ্যানিশিং লেডি ছবিতে তিনি এটা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে গোদার সেটা আত্মস্থ করে যথেচ্ছভাবে ব্রেথলেস ছবিতে ব্যবহার করে চলচ্চিত্র আঙ্গিকে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এই জাম্পকাটের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো যে পরবর্তীকালে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধরনের পরিচালক এই সম্পাদনা-পদ্ধতির ব্যবহার এড়াতে পারেননি। ১৯৬৭ সালে আমেরিকান চলচ্চিত্রকার আর্থার পেনের বনি এণ্ড ক্লাইড ছবিটির কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায়। এছাড়াও পরবর্তীকালের আমেরিকান ছবির দুই স্তম্ভ মার্টিন স্করসিস এবং ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার ছবিতেও জাম্পকাটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ গোদার ব্যবহৃত জাম্পকাট সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি। আজও তা আরো বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেদিনের জাম্পকাট আজকের কাহিনিচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, মিউজিক ভিডিও সবেতেই বক্তব্য প্রকাশের একমাত্র অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মানুষের তো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। এ্যারাইভ্যাল অফ এ ট্রেন দেখে সেদিনের দর্শক হুড়মুড় করে ভয়ে হল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ সেটা ছিল তাদের কাছে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আজ কিন্তু

সে দর্শক চলচ্চিত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ দৃশ্য দেখেও ভয়ে পালাবে না। জাম্পকাটও আজ দর্শক একইভাবে গ্রহণ করেছে, চলচ্চিত্রবিজ্ঞানী গোদারের এ এক ঐতিহাসিক অবদান। তাই ব্রেথলেস দেখে চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ড রাউড মন্তব্য করেন যে গোদারের আবির্ভাবকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : চলচ্চিত্র, গোদারের আগে এবং চলচ্চিত্র, গোদারের পরে। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পাদনায় জাম্পকাটের অমোঘ ব্যবহার গোদারের চলচ্চিত্র প্রতিভার একটি দিক মাত্র, সবটা নয়। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়র দ্বারা নামকরণের আগেও প্রকৃতিতে অক্সিজেন ছিল, তেমনই মানুষের মনের মধ্যেকার জাম্পকাট সদৃশ ঘটনাকে গোদার চলচ্চিত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রায় ব্যবহার করলেন। এখানেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে তার সাযুজ্য। পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য গোদার কখনো আঙ্গিককে ব্যবহার করেননি। আঙ্গিককে ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাই ছবিতে তিনি অনায়াসে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান। ১৯৬১ সালে গোদার বানালেন এ ওম্যান ইজ এ ওম্যান। গোদার বলেন যে এটিই তাঁর প্রথম সত্যিকারের ছবি। এ ছবিতে তিনি ইমেজ-এর মাঝে মাঝে হঠাৎ করে পর্দায় কথা গুঁজে দেন এবং দর্শককে সরাসরি প্রভাবিত করার চেষ্টার সেই শুরু। পরবর্তী ছবি ১৯৬২ সালে নির্মিত মাই লাইফ টু লিভ। প্যারিসের এক মহিলার গণিকাবৃত্তিকে বরণ করে নেবার এক করুণ কাহিনি। সুশান সনট্যাগ যে ছবি সম্বন্ধে বলেন যে এটি গোদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুষমামণ্ডিত ছবি। ছবির মূল চরিত্র নানাকে প্রথমেই সারা পর্দা জুড়ে দেখানো হয়। বারে বারে মুখটি দেখিয়ে দর্শককে মুখমণ্ডলের অন্তরালের মনোভাব বা মনোজগৎ আন্দাজ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। মুখটি বারে বারে ফিরে ফিরে আসে। প্রত্যেকটি এ ধরনের শটের শুরুতে বারে বারে সঙ্গীতের অংশ শুনিয়ে গোদার যেন বলতে চান হয়তো বা সঙ্গীত মেয়েটির অন্তস্তলের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে নির্মিত তুত ভা বিয়েন ছবিতে চলচ্চিত্রের কাঠামোকে পর্যালোচনা করেন। কিছু প্রশ্ন তোলেন। প্রেম কি কোনো সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করতে পারে? সমাজ-বিপ্লবের পরেও কি আদর্শবাদ বজায় থাকে? সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি তা বুঝতে চান। ১৯৬৩ সালে নির্মিত এ লিটল সোলজার ছবিতে তিনি আলজেরিয়াকে ফ্রান্সের উপনিবেশ করে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেখানে তিনি স্পষ্টতই ফরাসী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাধারণ আলজিরিয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল। যারা গোদারকে আঙ্গিকসর্বস্ব বলে গালাগালি দেন তারা কি বলবেন? আঙ্গিকসর্বস্ব হলে তৎকালীন ফরাসী সরকার ছবিটিকে আলজিরিয়ার সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মুক্তি দিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন কেন? প্রায় এক বছর ছবিটি ফ্রান্সে নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৬৩ সালে নির্মিত দি রাইফেল ম্যান বা লেস ক্যারিবিনিয়ারস-এ গোদার যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ ছবিতে

বের্টোল্ট ব্রেষ্ট এর এ্যালিয়েনেশান এর প্রভাব স্পষ্ট। রবার্ট রোজেলিনি ছবিটির বুননে গোদারকে সাহায্য করেছিলেন। দুজন কৃষক এ ছবির মূল চরিত্র। গোদার দেখালেন যে এই কৃষকদ্বয় কিভাবে রাজতন্ত্রের প্রভাবে পড়ে আস্তে আস্তে আরও গরিবে পরিণত হয়ে ওঠেন যদিও তাদের প্রাথমিক ধারণা ছিল যে রাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে তাদের দুর্দশা ঘুচবে। গোদার এ ছবিতে রাজতন্ত্র বিরোধী। ১৯৬৩ সালে নির্মিত কনটেম্পট ছবিটি গোদারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। হলিউডের স্টুডিও ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পতনের আগাম ইঙ্গিতবাহী এ ছবি। গোদারের প্রতিভার আর এক উদাহরণ দি ম্যারেড ওম্যান ছবিটি। ১৯৬৪ সালে এ ছবিটি নির্মাণের ব্যাপারে এক মজার গল্প আছে। সেদিনের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের প্রোগ্রামার ক্যানস চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে দেখেন যে সে বছরে নির্মিত দি ব্যাণ্ড অফ আউটসাইডারস ছবিটি দেখানো হচ্ছে। কিন্তু তিনি তো ভেনিসেই ছবিটি দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই হতাশা ব্যক্ত করতেই গোদার তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন যে আগামী তিন মাসের মধ্যে আর একটি ছবি ভেনিসে দেখানোর জন্য তিনি তৈরিই করে ফেলবেন। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একমাসেই তিনি সে ছবি তৈরি করে ফেলেন। এ ছবি দেখে অভিভূত হয়ে জর্জ শাদুল গোদারকে আধুনিক যুগের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসাবে অভিহিত করেন। ফিল্ম নোয়্যার এবং কল্পবিজ্ঞানও তাঁর ছবির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে ১৯৬৫ সালে নির্মিত আলফাভিল ছবিতে। গোদার এবং তাঁর বিশ্বস্ত চিত্রগ্রাহক রাউল কুতার মিলে আলো-আঁধারীর যুগান্তকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এ ছবিতে। মাও সে তুঙ এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুষঙ্গও গোদারের ছবির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে যখন ১৯৬৭ সালে তিনি লে শিওনিজ ছবিটি নির্মাণ করেন। এ ছবিতে বিষয়বস্তু আঙ্গিককে পরিচালিত করে। সারা ছবি জুড়ে মন্তাজের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে কোনো পারম্পর্য ছাড়াই গোদার শটের পর শট ক্যামেরাবন্দী করেন। সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি সেগুলোর মধ্যে এক শৃঙ্খলা আনেন। পাঁচটি মূল চরিত্রের বিদ্রোহী মানসিক অবস্থান বোঝাবার জন্য গোদার এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। মাও প্রদর্শিত পথে বিশ্বাস করা মানেই যে সমাজ-পরিবর্তন নয়, প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া আবেগসর্বস্ব ছাত্র রাজনীতি যে কোন পথের সন্ধান দিতে পারে না গোদার তা দেখান। পুলিশের আক্রমণ কিভাবে গেরিলা কায়দায় প্রতিহত করতে হয় তারও এক আশ্চর্য দলিল এই ছবি। গান, শব্দ এবং ইমেজ-নিরপেক্ষ শব্দের ঝংকার এ ছবিকে এক আধুনিক ব্যালাডের পর্যায়ে উন্নীত করে। ১৯৬৮ সাল গোদারের জীবনে এক স্মরণীয় বছর। ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের সাথে বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন গোদার, নিজে রাস্তায় নেমে। গোদার এবং ছাত্রেরা সে বছরের ক্যান্‌স্‌ চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তাদের আবেদনে

সাড়া দিয়ে লুই মাল, রোমান পোলানস্কি, মণিকা ভিত্তিরা জুরী হিসাবে পদত্যাগ করলেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ তো করবেনই না, মূল প্রেক্ষাগৃহে কার্লোস সউরার পেপারমিন্ট ফ্র্যাপে দেখিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করবেন। ছবি শুরু হওয়া মাত্রই গোদার, ত্রুফো এবং স্বয়ং কার্লোস সউরা মঞ্চে উঠে প্রদর্শনীর সামনে কালো পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো বন্ধ করে দেন। হয়ত পরবর্তীকালে এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লীতে সফদর-হাসমীর হত্যার প্রতিবাদে শাবানা আজমী চলচ্চিত্র উৎসবের একটি ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দেন। বলার কথা এই যে গোদার শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলী দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেননি, তাঁর একধরনের বিদ্রোহী সত্তা দিয়েও মানুষকে প্রভাবিত করেছেন।

এককথায় বলা যেতে পারে যে গোদার হলেন নতুন দিগন্তের সিনেমার জন্মদাতা তথা সিনেমার মুক্তিদাতা। সিনেমা তাঁর রক্তে। সিনেমার জন্যই যেন তাঁর জন্মগ্রহণ। তাঁর কর্মপদ্ধতিটি ছিল অদ্ভুত। তিনি দিনে মাত্র তিন ঘণ্টা শুটিং করতেন এবং বাকি সময় সিনেমার নব নব উদ্ভাবনের কথা ভাবতেন। কোনওটাই মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। সঙ্গীত তাঁর ছবিতে হঠাৎ করে আসে আবার হঠাৎ করে চলে যায়। মাঝে মাঝেই তাঁর ছবিতে শব্দ এবং ইমেজ আলাদা হয়ে যায়। অভিনেতাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ তিনি আলাদা আলাদা ফ্রেমে ধরেন এবং পরমুহূর্তেই একটার ওপর আরেকটা চাপিয়ে তিনি এক নতুন স্তর তৈরি করেন। চরিত্রায়ণের এক নতুন অর্থ উঠে আসে। ভৌত পরিবর্তনের থেকে চলচ্চিত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন উঠে আসে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসের এক অতন্দ্র মনোযোগী ছাত্র গোদার। তাই তাঁর বিভিন্ন ছবিতে বারেবারে অন্যান্য অসংখ্য ছবির ইমেজ ভেসে আসে। তিনি দর্শককে মনে করিয়ে দিতে চান সিনেমা ইতিহাস বহির্ভূত কিছু নয়, হতে পারে না। অন্যদিকে তাঁর অনেক ছবিতেই মার্কসীয় বীক্ষার আদলে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা যায়। উইকএণ্ড ছবিটি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির এক পথপ্রদর্শক। আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক এই ছবিতে বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত সংকটকে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। প্যারিসের রাস্তায় গাড়িতে ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা এক দম্পতির মানসিক অবস্থা বোঝাতে গোদার দীর্ঘ আট মিনিটের এক ট্র্যাকিং শট ব্যবহার করেন। উইকএণ্ড ছবির শেষে তিনি ক্যাপশন দেন এণ্ড অফ সিনেমা বলে। পিয়ের দি ফুল ছবিতে গোদার ভিয়েতনাম যুদ্ধের অনুষঙ্গ টেনে আনেন এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যলিপ্সার সমালোচনা করেন। ছবি শেষ হয় একটি ক্যাপশান দিয়ে 'লং লিভ মাও'। তিনি নাকি সমাজ-সচেতন ছিলেন না। তাহলে উইকএণ্ড ছবিতে কার্ল মার্ক্সের কথা কেন বারে বারে আসে? পুঁজিবাদ যে মানুষের মধ্যে কমোডিটি ফেটিশ তৈরি করে মার্ক্সীয় বীক্ষার এই দিকটি গোদার তুলে ধরেন। আবার লেটার টু জেন ছবিতে ভিয়েতকংদের সঙ্গে জেন

ফগুার এক স্থির চিত্র স্থানুবৎ পর্দায় রেখে দিয়ে গোদার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে তুলোধোনা করেন। কেন গোদার চলচ্চিত্র বিজ্ঞানী তার আর একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। ১৯৭৮ সালে মোজাম্বিক সরকার গোদারকে একটি ছবি করতে বলেন। কোডাক ফিল্ম দিয়ে ছবি করতে গিয়ে তিনি দেখেন রঙীন এই ফিল্ম-ষ্টক দিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের গাত্রবর্ণের বাদামী বা কালো চামড়ার প্রতিরূপ কিছুতেই আনা যাচ্ছে না। তাই তিনি কোডাক ফিল্মকে বর্ণবিদ্বেষী বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেন না। ১৯৯৫ সালে কিন্তু কোডাক এই র-ষ্টক পরিবর্তনে বাধ্য হয়। এ ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আর কোনো উদাহরণ আছে কি? এ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে গোদার ১৯৮৯ সালে নির্মাণ করেন 'হিস্ট্রি অফ সিনেমা'। এখানে গোদার সমাজমনস্ক এক ইতিহাসবিদ। সিনেমা কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, তার আবেগানুভূতিকে উসকে দেয়, সিনেমার ইতিহাস আসলে যে ফটোগ্রাফি থেকে ছিন্ন হওয়ার ইতিহাস এসব ভাবনা নিয়ে এ ছবি তার এক সন্দর্ভ। সাধারণ অনুসন্ধিৎসায় সারা পৃথিবীর অসংখ্য ছবি থেকে উদাহরণ দিয়ে গোদার যুগে যুগে বাস্তবতাকে সিনেমা কিভাবে প্রকাশ করেছে তা দেখান। সিনেমা যে টেলিভিশন নামক মাধ্যমটির অভিঘাত থেকে মুক্তি পেতে চায় গোদার তা প্রমাণ করেন। কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। শতাব্দী জুড়ে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা একের পর এক পর্দায় উপস্থাপিত করে গোদারও সে রকম এ ছবির মাধ্যমে বলতে চান বুর্জোয়া সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে মানব-ধ্বংসের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের হিংসার ইতিহাস। ২০০৪ সালে নির্মিত নোত্রে মিউজিক ছবিতে গোদার সারাজেভোর যুদ্ধকে সামনে রেখে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধলিপ্সার ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করেন। সারা পৃথিবীর কোন যুদ্ধই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। এমন কি অতীতের আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং হাল আমলের ইজরায়েল, প্যালেস্তাইনের সংকটের বিষয়বস্তু তিনি অনুষঙ্গ হিসাবে টেনে আনেন। ২০১০ সালে নির্মিত ফিল্ম সোস্যালিজম ছবিতে আমরা গোদারকে অন্য রূপে দেখতে পাই। আপাতদৃষ্টিতে এই ছবি অসংলগ্ন, মানুষ কি দৃষ্টিভঙ্গিতে চলচ্চিত্র দেখবে সে ধারণায় সম্পৃক্ত। ভূমধ্যসাগরে বিচরণরত এক জাহাজকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে গোদার আদতে বলতে চান যে আধুনিক সভ্যতা তো এলোমেলোই। তাই এই জাহাজ বিভিন্ন সভ্যতা অতিক্রম করতে যাচ্ছে। মিশর, গ্রীস, প্যালেস্তাইন এবং সভ্যতার সব বন্দরগুলো জাহাজটি অতিক্রম করে। আসে বিখ্যাত ওডেসা সিঁড়ির দৃশ্য। পৃথিবীর তথাকথিত উন্নতি, সভ্যতার অন্তরালে যে অগণিত সাধারণ মানুষের কান্না, ঘাম, রক্ত লুকোনো আছে তা গোদার দেখান। পৃথিবীর তাবড় তাবড় পরিচালকদের মতো তিনি নিজেকে শুধুমাত্র নিজের দেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখেন না। হয়ে ওঠেন বিশ্বসভ্যতার শরিক। জাহাজটি আসলে মানুষের এক সভ্যতা

থেকে আরেক সভ্যতায় যাতায়াতের দ্যোতক। এ ছবিতে ইমেজ-এর সমান্তরাল ধারায় তিনি সভ্যতার ধারাবিবরণী দিতে থাকেন। বিখ্যাত লেখকদের সভ্যতা সংক্রান্ত উক্তি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। স্থির চিত্র ব্যবহার করেন। তার ধারাভাষ্যের মধ্য দিয়ে উঠে আসে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি, যুদ্ধ, নারী, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি, প্যালেস্তাইন, হিটলার, স্ট্যালিনের নাম। আজকে যে ভিডিও রচনাপদ্ধতি নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি গোদার কিন্তু সেদিন তাঁর ছবিতে সেটাই করেন। ২৪ ফ্রেম-এ অভ্যস্ত গোদার ২৫-ফ্রেমের ডিজিটাল প্রযুক্তিকে আশির অধিক বয়সে আত্মসাৎ করে ফটোগ্রাফির এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন। এমনকি সেলফোন-এ তোলা ছবিও গোদার ব্যবহার করেন। বক্তব্য প্রকাশের স্বার্থে আধুনিকতম প্রযুক্তির সাহায্য নিতে তিনি দ্বিধাহীন। তিনি প্রমাণ করেন শেখার কোনো বয়স নেই। এই ছবি দেখার পর গোদারের এক বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে— "সিনেমা ইজ দি ট্রেন, নট দি ষ্টেশন।" এ ছবির কথা সর্বস্বতাকে অনেকেই পছন্দ করেননি কিন্তু সিনেমা সম্বন্ধে গোদারের একটি উক্তি থেকে বোঝা যায় যে ইতিহাসগতভাবে তাঁকে এটা করতেই হোত। সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতে গোদারের মনে হতো সিনেমা দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। আস্তে আস্তে তিনি সে ব্যাপারে মোহমুক্ত হন। আমেরিকান ছবি সম্বন্ধে তারকোভস্কি বলেছিলেন যে ওগুলো ছবি নয়, ইভেন্ট বা ঘটনা। ফ্র্যাঙ্ক কাপরা বা গ্রিফিথ প্রদর্শিত পথ পরিহার করে যেদিন থেকে ফ্যান্টম-ব্যাটম্যানরা সিনেমাকে গিলে খেতে লাগলো গোদার বুঝলেন সিনেমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। শুধু ইমেজ দিয়ে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। তাই তাঁর পরবর্তীকালের ছবিতে কথার এত আধিক্য। জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তিনি বুঝলেন যে ইমেজের পাশাপাশি কিছু কথা বলাও দরকার। তিনি তথাকথিত সিনেমার মৃত্যু ঘোষণা করলেন। আক্ষরিক অর্থে নয়, আত্মিক উপলব্ধিতে। কথা সর্বস্বতার এই প্রভাব আমরা সত্যজিৎ রায়ের শেষদিকের ছবিতেও পাই। যে গোদারকে নির্মাণশৈলীর জন্য সত্যজিৎ চিরকাল প্রশংসা করে এসেছেন কিন্তু ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে কখনও গোদারকে অনুসরণ করেননি — প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির সেই নার্সের দৃশ্য নেগেটিভ-এ দেখানো ছাড়া—তিনিও তাঁর শেষ দিকের ছবিতে ইমেজের চেয়ে বক্তব্য প্রকাশের হাতিয়ার হিসাবে কথাকে বেছে নেন। তাঁর এ কাজে গোদারের প্রভাব স্পষ্ট। ২০১৯ সালে কলকাতার শিশির মঞ্চে প্রদত্ত সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতায় তরুণ মজুমদার জানান যে একবার এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেন যে শুধুমাত্র সংলাপের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গী চলচ্চিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক। অথচ এই সত্যজিৎ শাখাপ্রশাখা এবং আগন্তুককে একেবারেই সংলাপ নির্ভর ছবি হিসাবে গড়ে তোলেন। তা হলে কোন্ সত্যজিৎ ঠিক? আসলে দুটোই ঠিক। শিল্পের ক্ষেত্রে সময়ই চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত

করে। একসময় যেটা ঠিক বলে মনে হোত পরবর্তীকালে সেই উপলব্ধি পরিবর্তিত হতে থাকে। শিল্পের চলমানতার এটাই ধর্ম। তাই ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও গোদার আর সত্যজিৎ এক হয়ে যান। আবার ফিরে আসে ফিল্ম সোস্যালিজম ছবি। অন্তত একটি ইমেজের কথা উল্লেখ করতেই হবে। এক প্যালেস্তনীয় সার্কাসে ট্র্যাপিজ শিল্পীরা কলাকৌশল দেখছে। রূপকার্থ হোল যেদিন পৃথিবীতে ইহুদি এবং আরবেরা হানাহানি ভুলতে পারবে সেদিনই হবে ইতিহাসের অন্যতম সুন্দর সময়।

২০১৪ সালের গুডবাই টু ল্যাংগুয়েজ ছবিতে আবার অন্যরকম পরীক্ষা। থ্রি-ডি আঙ্গিকে এ ছবি তিনি করলেন। বয়সের সাথে সাথে প্রাকৃতিক কারণেই ন্যুব্জ হচ্ছেন কিন্তু নিরীক্ষা করতে পিছপা নন। বিষয়বস্তুর কথায় পরে আসা যাবে। ত্রিমাত্রিকতার এক নবতম ব্যবহারে তিনি আমাদের চমৎকৃত করেন। একই দৃশ্যের দুটি আলাদা আলাদা শট তোলেন তিনি। ত্রিমাত্রিক টেকনোলজির এক অনবদ্য ব্যবহারে ডুয়েল প্রোজেকশন পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি যখন দৃশ্যটিকে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত করেন, আমাদের বাঁ চোখ দৃশ্যটির একটিমাত্র দিক দেখতে পায়, একই সঙ্গে ডানচোখ দৃশ্যটির সম্পূর্ণ অন্য অংশ দেখতে পায়। একই দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত দুটি ফ্রেমের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দৃশ্য দর্শককে এই স্বাধীনতাও দেয় যে সে কোন্ অংশ দেখতে চাইবে। এ যেন আইজেনস্টাইনের মন্তাজ এবং আঁদ্রে বাজাঁর ডিপ ফোকাস ফটোগ্রাফির নান্দনিক সংমিশ্রণ। পৃথিবীর আর কোনো চলচ্চিত্রকার এভাবে ভাবতেই পারেননি। অথচ বাস্তব জীবনে অহরহ এমন ঘটনা ঘটে যে একই দৃশ্যে আমাদের চোখ ডানদিকের অংশ বা বামদিকের অংশ আলাদাভাবে দেখতে পায়। মানুষের পেরিফেরাল ভিশন নিয়েও গোদার পরীক্ষা করলেন। বাস্তবতার যে এত পরত এটা আজ পর্যন্ত আর কোনো পরিচালক দেখাতে পারেননি। বাস্তবের একমাত্রিক ব্যবহার তিনি ভেঙে চুরমার করে দেন। পদার্থের বাইরের গঠন যেমন সত্য তেমনি তার ভেতরের অণু-পরমাণুর গঠনও একই সাথে সত্য। বিজ্ঞানী ছাড়া সাধারণ মানুষ সেটা উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু বুঝিয়ে দিলে তারা বুঝবেন না এমনটা নয়। কারণ মানুষ তো বোকা নয়। তাই যারা বলেন গোদারের ছবি মানুষ বুঝবে না তারা সেই ছোটবেলার গল্প শোনার সেই অভিজ্ঞতা থেকে বেরোতে পারছেন না। গুডবাই টু ল্যাংগুয়েজ ছবিটি এক অর্থে এতাবৎকাল প্রচলিত নির্মাণশৈলী, কনভেনশান, ফর্মূলা ইত্যাদি ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। নারী-পুরুষ যুগল এবং এক কুকুর এই ছবির কাঁচামাল। তারা পরস্পর কথোপকথনের মাধ্যমে একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করে। আর তাদের নীরব সঙ্গী একটি কুকুর। অধিকাংশ সময়ই তারা নগ্ন। সংলাপ নির্ভর এই ছবিতে একটি সংলাপ কি ভয়ঙ্কর সত্য প্রকাশ করে তা বোঝা যায় যখন পুরুষ চরিত্রটির মুখে গোদার বলান যে—"এ ডগ ইজ নট নেকেড, বিকজ ইট

ইজ নেকেড।" সত্য কিন্তু কি ভয়াবহ সত্য। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে গোদার বিজ্ঞানী থেকে একমুহূর্তে হয়ে উঠলেন দার্শনিক। নগ্নতা কি শুধুমাত্র পোশাকের নগ্নতা? মনের নগ্নতা নয়! স্বাভাবিক নিয়মেই কুকুর বা পশুরা নগ্ন। আপাতদৃষ্টিতে নগ্ন হলেও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে যে পশুদের এই নগ্নতায় কোনো দ্বিচারিতা নেই। তারা একে অপরকে নিধন করে না, সমস্ত শঠতা থেকে দূরে থাকে। আর মানুষ? এই সংলাপ যেটি ছবিতে আমাদের শোনানো হয় তার পাশাপাশি গোদার আসল সংলাপটি অনুচ্চারিত রেখেছেন। তিনি যেন ইঙ্গিত দেন যে—এ ম্যান ইজ নেকেড বিকজ হি ইজ নট নেকেড। অর্থাৎ মানুষ, পোশাক-পরিহিত মানুষ বহিরঙ্গে নগ্ন না হলেও সে আসলে মানসিকভাবে নগ্ন। তাই তো তথাকথিত পোশাক পরিহিত মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একে অপরকে আক্রমণ করে চলেছে, এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষকে পরাধীন করে সাম্রাজ্য দখল করতে চাইছে। ক্ষমতাবান মানুষের ইতিহাস তো খুন, ধর্ষণ, সম্পদ লুণ্ঠনের ইতিহাস, মানুষই তো নিজের প্রজাতিকে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস করে, পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে একত্রে কত বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা যায়, শুধুমাত্র সেটা পরখ করবার লক্ষ্যে অসহায়, নিরস্ত্র মানুষের ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। আসলে তো মানুষ ক্ষমতা, অর্থ ইত্যাদি ভোগের আশায় নগ্ন। শুধুমাত্র পোশাক দিয়ে কি এই নগ্নতা ঢাকা যায়? তার চেয়ে ঢের ভালো হোত না কি যদি মানুষ পশুদের মতো বহিরঙ্গে নগ্ন হয়েও অন্তরে এমনতর নগ্ন না হতো? দার্শনিকের প্রজ্ঞায় গোদার এই প্রশ্ন তোলেন। চলচ্চিত্র বিজ্ঞানী থেকে তিনি হয়ে ওঠেন সমাজ-সচেতন দার্শনিক। কেউ যদি গোদারকে এর জন্য নিরাশাবাদী বলতে চান, বলতেই পারেন কিন্তু ইতিহাসবীক্ষণ করে যুগ যুগ ধরে মানুষের ধ্বংসলীলার সাক্ষী হয়ে তিনি মানব-সভ্যতা নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠবেন? বহুকাল আগে বার্ট হানস্ত্রা তো তাঁর দি এপ এ্যণ্ড সুপারএপ ছবিতে মানুষকে সুপারএপ বলেছিলেন কারণ পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রজাতি যে স্বার্থান্ধ হয়ে নিজের প্রজাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এই যখন পৃথিবীর অবস্থা তখন গোদার মনে করলেন যে শুধুমাত্র ইমেজএর তাঁবেদারী করলে চলবে না, চাই তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার সংলাপ। তাই এই পর্বের ছবিতে কথা, কথা আর কথা। গোদার মনে করলেন দৈনন্দিন জীবনে মানুষের বলা কথার অধিকাংশই নিরর্থক এবং আমিত্বে ভরা। প্রয়োজন মানুষকে কিছু গূঢ় সত্য কথা শোনানোর। তার অস্ত্র তো একমাত্র চলচ্চিত্র। তাই তিনি যথাসাধ্য নিজের মতো করে চলচ্চিত্র দিয়ে মানুষকে সচেতন করেন। সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাস ঘেঁটে তিনি এই সংলাপ সৃষ্টি করেন।

মার্ক্সের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও দু একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া পৃথিবীকে পরিবর্তনের স্বপ্ন সফল হয়নি। তেমনই সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গোদারের এই অল্প আশা হয়ত

বাস্তবায়িত হবে না। তথাপি রাজনীতি সচেতন সমাজবিজ্ঞানী এবং চলচ্চিত্র বিজ্ঞানীকে একই সুরে কথা বলতেই হবে। শতাধিক বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও যেন মার্ক্স এবং গোদার একই সুরে কথা বলেন। এখানেই গোদারের ইতিহাসবেত্তা। এবার আসা যাক তাঁর এখন পর্যন্ত নির্মিত সর্বশেষ ছবির আলোচনায়। এ ছবিতে শব্দ, সংলাপ-এর পাশাপাশি ইমেজের এক অসাধারণ নান্দনিক ব্যবহার তিনি ফিরিয়ে আনলেন। ছবির শুরুতেই পর্দাজোড়া দু-হাতের দশ আঙুল এবং করতলপৃষ্ঠের ইমেজ। মনে রাখতে হবে তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশি। বিজ্ঞানের নিয়মে যে বয়সে অধিকাংশ মানুষের মস্তিষ্কের মরচে পড়া দশা হয় সে বয়সে আবার চলচ্চিত্র মাধ্যমকে ব্যবহার করে মানবসভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করা। কথা, কথা আর কথার পরিবর্তে এখানে ইমেজ, ইমেজ আর ইমেজ। নেপথ্য থেকে ভেসে আসে কথা। এখানে গোদারের প্রাবন্ধিক সত্তার সম্পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে। সিনেমা এবং সভ্যতার বিবর্তনের এ এক আশ্চর্য মিল। জন-হেনরির গাথা সারাবিশ্বে প্রচলিত। মানুষের হাতে কিভাবে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এক স্থানে রেললাইন পাতার ক্ষেত্রে যন্ত্রকে তিনি পরাজিত করেছিলেন সে গাথা আমরা জানি। পর্দাজুড়ে দুটি হাতের ক্লোজ-আপ ব্যবহার করে গোদার বলছেন মানব-সভ্যতার ইতিহাস মানুষের হাত সঠিক ভাবে ব্যবহার করার ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা এ ছবির বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি অসংখ্য চলচ্চিত্র-দৃশ্যের ফুটেজ আমরা দেখতে পাই। একটি ইমেজ বা দৃশ্যকল্প কিন্তু বারে বারে ফিরে আসে। এক আরব শিশু ৩৫ মিমি ফিল্ম রীল গোটাতে গোটাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। হাতের মোটিফ এ ছবিতে ফিরে ফিরে আসে, আঙ্গিকগতভাবে শব্দ নিয়ে তিনি এমন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। ইমেজ ফুঁড়ে যেখান-সেখান থেকে তাঁর মানবসভ্যতার ধারা-বিবরণীর ইতিহাস শোনা যায়। বামদিক, ডানদিক, মাঝখান, সব দিক থেকেই শব্দ বর্ষিত হতে থাকে। দর্শক অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। শব্দের এই যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই করেন। তিনি বাস্তবের দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহের দর্শকের দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করেন। বাস্তবে মানুষ যখন কোনো খোলা স্থানে কথোপকথন চালায় তখন সে কিন্তু নিজেদের কথার পাশাপাশি আশেপাশের অনেক কথা, শব্দ শুনতে পায়, অস্বস্তি বোধ করে না। সেই দর্শকই প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করা মাত্র বাস্তবসদৃশ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করে। মানুষের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে শর্তাধীন বাস্তবতা। এ ছাড়াও এ ছবিতে আরব বিশ্বে প্যালেস্তানীয়দের প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্ট। ছবির শেষ পর্যায়ে কালো পর্দা জুড়ে গোদারের স্বরপ্রক্ষেপণে দর্শককে আশবাদ-এর প্রতি নিরাশ না হবার আহ্বান জানানো হয়। ইমেজ বুক প্রকৃত অর্থেই এক ইমেজ বুক। সেখানে চলচ্চিত্র-ক্লিপিংস-এর পাশাপাশি

এমনকি অসংখ্য ভিডিও এবং ইউটিউবের ক্লিপিংসও দেখানো হয়। দর্শক এবং চলচ্চিত্রকারের মধ্যেকার অদৃশ্য দেওয়াল ভাঙার প্রচেষ্টায় ব্রতী গোদার তাঁর ইমেজ বুক ছবিতে এই দেওয়ালকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। হিংসাবিদীর্ণ এই বিশ্বে এই ছবি যেন গোদারের গুয়ের্নিকা।

রঙ-এর ব্যবহারেও গোদার ছিলেন অনন্য। লাল রঙ তাঁর কাছে যৌবন, বিপ্লবের প্রতীক, তাই লা শিওনিজ ছবিতে লাল রঙের এত প্রাধান্য আবার পিয়ের লা ফু ছবিতে নীল রঙের ব্যবহার করে যেটা চোখের সামনে বা চরিত্রের বাস্তব-জীবনে ঘটছে সেটা বোঝান, আবার লাল রঙের ব্যবহারে যেটা ঘটা উচিত সেটা বোঝান। শুধু গুডবাই টু ল্যাংগুয়েজ ছবিতে নয়, গোদারের ছবিতে নগ্নতা একটা অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। মানুষ যতদিন নগ্ন থাকে অর্থাৎ শৈশবকাল পর্যন্ত, সে কিন্তু আসলে নগ্ন নয় যা ভবিষ্যতে আবরণে দেহ ঢাকবার দিন থেকে সে হয়ে উঠবে। এই আবরণ আসলে সত্যকে আড়াল করার লক্ষ্যে মিথ্যা আবরণ। আবরণ গুণ্ঠিত মানুষ অপেক্ষা আরবণহীন শৈশবে ফিরে যাওয়া মানুষের সভ্যতার পক্ষে মঙ্গলদায়ক। তাই গোদারের কাছে সভ্যতার ইতিহাসের আরেক অর্থ অসভ্যতার ইতিহাস। নগ্নতা নিয়ে বিটলসএর জন লেনন একবার আক্ষেপ করেন যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো সংকট হলো ভালোবাসা-জারিত নরনারীর যৌন মিলন, যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানুষ তৈরি হয় তা প্রকাশ্যে দেখানোর ক্ষেত্রে অজস্র বিধিনিষেধ আরোপ অথচ মানুষের নিত্য হানাহানি, যাতে মনুষ্য প্রজন্ম ধ্বংস হয় তা দেখানোর ক্ষেত্রে বাধাহীনতা। গোদার এই বিধিনিষেধ মানেন না বলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অনেক ছবিতেই নগ্ন নারীদের দেখা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ছবিতে তা কেবলমাত্র যৌন আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দেবার তাগিদে নয়। মপাসাঁ দেখিয়েছিলেন যে শিশুকে স্তন্যপান করানো মহিলা কখনও যৌন উত্তেজনার দ্যোতক হতে পারে না, গোদারের ছবিতেও তেমন নগ্নতাই নগ্নতাকে ধ্বংস করে। প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন গোদার। সিনেমায় গল্প বলা সম্বন্ধেও গোদারের ধারণা স্পষ্ট। তিনি তাঁর ছবিতে গল্প বলতে চান না সেটা যারা বলে তারা গোদারের এই উক্তিটি শুনে নিশ্চয়ই স্বস্তি বোধ করবেন যে, "আই সর্ট টু ফাইণ্ড আউট ইন ফিল্মস ইফ সার্টেইন ইমেজেস, সার্টেইন সাউণ্ডস কুড টেল এ স্টোরি, বিকজ ইন এ্যাডিশন টু ড্রয়িং, ইউ ষ্টিল হ্যাভ টু টেল এ ষ্টোরি।" গোদার তাঁর ছবির দর্শকের কাছ থেকে মানসিকভাবে সক্রিয় থেকে গল্প খুঁজে বার করার অধ্যাবসায় দাবি করেন। দর্শককে নিয়ত তাঁর ছবির গল্প নির্মাণ করতে হয়।

গোদারকে অবশ্যই এক উত্তর-আধুনিক শিল্পী বলতেই হয় কারণ উত্তর-আধুনিকতা বা পোষ্টমডার্নিজম-এর লক্ষণ যথা গ্র্যাণ্ডন্যারেটিভ বর্জন, ইণ্টারটেক্সচুয়্যালিটি, চিন্তার

বহুত্ব, শিল্পকর্মের পরিণতি আগে থেকেই বুঝতে না পারা—সেগুলো তাঁর চলচ্চিত্রসৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অনেকে এ ধরনের তকমা দেওয়া অপছন্দ করেন অথচ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় এ ধরনের অসংখ্য তকমার উদাহরণ আছে। তাই তো একধরনের সঙ্গীতশিল্পীকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী বলা হয়। অঙ্কন শিল্পের ক্ষেত্রে ইমপ্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজমের কথা আমরা জানি। কার্ল মার্ক্সের দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মার্ক্সবাদী বলা হয়। এই যুক্তিতে উত্তর-আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য-সম্পূর্ণ গোদারকে উত্তর-আধুনিক চলচ্চিত্রকার বলা যেতেই পারে।

তাহলে চলচ্চিত্র ইতিহাসে গোদারের স্থান কোথায়? চলচ্চিত্র নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা যদি বলা যায় তবে গোদার এক চলচ্চিত্র বিজ্ঞানী— চলচ্চিত্রে সভ্যতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ বা ক্যামেরাবদ্ধ করার কথা বলা হলে গোদার অবশ্যই এক ইতিহাসবিদ। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণার কথা বলা হলে তিনি মানবতাবাদী। সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের যোগসূত্রতার বিচারে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যিক-এর সমগোত্রীয়। মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের কথা বই না পড়ে বুঝতে পারবে এমনই কালজয়ী তাঁর চলচ্চিত্র প্রতিভা। ১৮৮৮ সালে মার্গারেট হার্কনেস-কে লেখা এক চিঠিতে এঙ্গেলস বলেন যে তিনি বালজাকের লেখা থেকে ইতিহাস সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছেন সেটা অনেক ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদের লেখা থেকেও জানতে পারেননি। অর্থাৎ কালজয়ী শিল্পের এমনই মহিমা যে ইতিহাস বই থেকেও তা বেশি মাত্রায় ইতিহাস সমৃদ্ধ। বালজাকের নিজের দেশ ফ্রান্সের চলচ্চিত্রকার গোদারের সম্বন্ধেও এ ধরনের কথা বলা যায়। আজ থেকে বহু বছর পরে শুধুমাত্র গোদারের ছবি দেখেই মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নেওয়া যাবে।

ব্রেথলেস ছবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গোদার সেদিন শুধুমাত্র চলচ্চিত্রে ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কালক্রমে প্রতিভার আগুনে এই ভৌত-পরিবর্তনকেই তিনি চলচ্চিত্রে রাসায়নিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত করেন। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো চলচ্চিত্র-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেবার চল থাকলে গোদার অবশ্যই সেই পুরস্কারের অন্যতম দাবিদার হতে পারতেন। কেউ কি কোনোদিন ভেবেছিল বব ডিলানের লেখা গানের পংক্তি একদিন সাহিত্যে নোবেল পাবে? আপাতত চলচ্চিত্রে নোবেলের ব্যাপার না থাকলেও হয়ত বা গোদারের ছবির চিত্রনাট্যও সাহিত্যের এমন মর্যাদা পাবে। এটা হল একটা দিক। আর একদিকে গোদারকে আইনস্টাইনের উত্তরসূরী বলা যেতে পারে, কারণ পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের অবদান, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও গোদারের অনুরূপ অবদান। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব, ব্ল্যাক হোল সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ আজ এত বছর পরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে গোদারের চলচ্চিত্রও

সময়ের চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে থাকা চলচ্চিত্র হিসাবে পরিগণিত হবে।

এ ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—বর্তমান যুগের এক প্রথিতযশা অস্ট্রেলিয় অভিনেত্রী কেট ব্ল্যানচেট-এর এক উক্তিতে। ২০১৮ সালে ক্যানস চলচিত্র উৎসবে গোদারের দি ইমেজ বুক-কে ইতিহাসে প্রথমবার শুধুমাত্র গোদারের জন্য বিশেষ পাম-ডি-ওর পুরস্কার দিতে গিয়ে পুরস্কার বিতরণী সভায় বিচারকদের প্রধান হিসাবে তিনি বলেন যে দি ইমেজ বুক ছবিটি সময়ের চেয়ে এতটাই এগিয়ে থাকা এক শিল্পকর্ম যে অন্যান্য ছবির সঙ্গে তুলনাই করা বাতুলতামাত্র। তাই সে ছবিটিকে আলাদা করে বিশেষ পাম-ডি-ওর দেবার সিদ্ধান্ত। জুরী প্রধান হিসাবে তার ভাষণটি অবিস্মরণীয়। "গোদার কনস্টান্টলি রি-ডিফাইনড সিনেমা — অলমোষ্ট স্যাট এপার্ট ফ্রম দি আদার ফিল্মস, অলমোষ্ট আউটসাইড টাইম এণ্ড স্পেস।" তাই বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গোদার এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর যুগপুরুষ। এ লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে লেনিনের উক্তিটি স্মরণ না করলে— "অফ অল দি আর্টস, সিনেমা ইজ দি মোষ্ট ইম্পরট্যান্ট।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে শিল্পকর্মের মধ্যে সিনেমাকে লেনিন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন ঠিকই তবে সিনেমার বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক কি হবে সেটা উহ্যই রেখেছিলেন। লেনিন কথিত এই গুরুত্ব সিনেমাকে গোদার দিয়েছিলেন কিনা তার বিচারের ভার ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। অন্তত গুরুত্ব দেবার চেষ্টা যে গোদার করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

২০১৯